Battley
togethernes

DELTA COMMUNITY CENTER



Sharodiya 2026



Middlesex Savings Bank®
right there with you

Supporting Local Businesses & Families Reach Their Financial Goals

Small Business & Commercial Lending
Commercial Real Estate Financing
Home Mortgages & Home Equity
Personal Lending Options

For more info please visit www.middlesexbank.com

EQUAL HOUSING LENDER MEMBER FDIC

Table of Content

4 Editorial | From the desk of M & M

5 ছোটবেলার পুজো | ঊর্মিমালা বসু

7 Ernestina Morrissey | Ketaki Dutta

10 দুই উৎসব, এক বাংলা | আসাদ জামান

17 অজ্ঞাতবাসে | শতভিষা মুখোপাধ্যায়

19 কামসূত্র মার্টিনি | মধুবাণী ঘোষ

21 মা-দুরে মা দুর্গা | তিমির মণ্ডল

23 Fred | Soumyarwit Manna

27 The Strange Scare of the Chapati Relay | Gouri Datta

29 ঘরে ফেরা | প্রসেনজিৎ মন্ডল

33 বাড়ির পুজো | সুপর্ণা দত্ত

From the desk of MG square

There is something about autumn in New England that takes us back to Kolkata.

As the leaves turn red and gold, and the New England air turns crisp, we are reminded of sharat in Bengal—the blue skies, drifting clouds, shiuli in the early morning, kash fields, and that unmistakable feeling that Pujo is near. The two places could not be farther apart, yet somehow, this season makes them feel close.

It is in that feeling of home and memory that Delta Community Centre has grown. At its heart is a simple idea: to keep a little India alive here. Our Friday gatherings in Easton bring together old friends and new faces, with stories, music, laughter, and the easy warmth of an evening back home. Throughout the year, our Delta Initiatives - Swagatam , Food Festivals, Artisan Connect, Musical Master tributes, and Parampara series give us reasons to return to the music, food, artists, and traditions we grew up with. Our AI lecture series for the community and technology classes for children reflect Delta's commitment to bringing emerging ideas and new learning opportunities to our community—preparing both adults and children for a rapidly changing world.

That same feeling reaches thousands at the Boston Durgabari pujo, where students far from home, young families, and longtime New England residents all come together. Anyone looking for that familiar Puja warmth has a place here. Heated tents, dance, music, quiz, prasad bhog, and the ever-popular "Chaye Garam" stall bring a little Kolkata to Boston. For a few days, even in the New England chill, it feels like home.

This first Sharodiya magazine is a celebration of that feeling—the memories we carry, the traditions we share, and the community we continue to build. Hope you enjoy the compositions we have presented for you.

As autumn colors New England in warm hues, may we always find the warmth of home in this community and carry a little piece of it wherever we go.

Wishing everyone a joyous Sharodiya and a very happy Pujo.

Manidip Ghosh

Manidip Ghosh

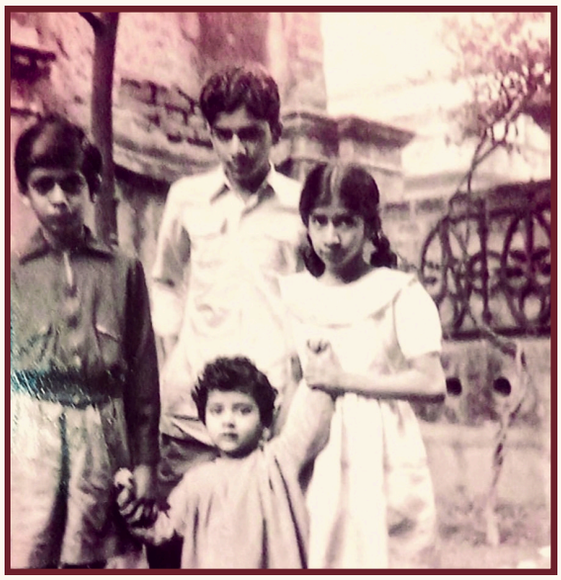
DELTA COMMUNITY CENTER

madhubanighosh

Madhubani Ghosh

|| ছোটবেলার পুজো ||

ঊর্মিমালা বসু | স্বনামধন্যা বাচিক শিল্পী



আমাদের বাড়ি মানে ছোটবেলার বাড়িটা আগে ভাবতুম , বেশ ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন। মানে পুজো নিয়ে বিশেষ কোন মাতামাতি ছিলনা। নতুন জামা, ঠাকুর দেখতে যাওয়া খুব ছোটবেলায় সে সব নিয়ে বাড়াবাড়ি একেবারে ছিল না। বছর ছয়েক বয়েস অবধি পুজো বলতে ছিল বাবার বন্ধুপ্রতিম দাদা সৌরীন্দ্র মোহন দত্তের বাড়ি অষ্টমী বা নবমীর দিন দুপুরে যাওয়া।সেখানে আমাদের পরিচয় ছিল ধনার ছেলেমেয়ে। বিশাল উঠোন ঘেরা বাড়ি। ঠাকুর দালানে পুজো হোত, একচালার ঠাকুর।খুব হাসিখুশি, তেল গড়ানো মুখে,ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপ আর সুবর্ণ কঙ্কন পরা রমনীরা খুব আদর করে পিতলের বড় বড় বারকোস থেকে গরম গরম লুচি,বেগুন ভাজা পরিবেশন করতেন। পিতলের প্রমাণ সাইজের নৌকোয় রসে জ্যবজ্যাবে লেডিকেনি আর কাঠের বড় পরাতে লাল হলুদ রঙের বোদের পাহাড়। ঠাকুর দ্যাখা , খাওয়া আর দুদিনের বন্ধু বুরানের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা এই ছিল খেলা আমাদের।

ছোটবেলার ওই সময়ের একটি সাদার ওপর সবুজ আর গোলাপি ছাপা ফ্রকের কথা খুব মনে আছে।প্রতিবেশী সাধনাদির মায়ের তত্ত্বাবধানে আমাদের মায়ের স্বহস্তে সেলাই করা।এইটি লিখতে লিখতে দুপুরবেলার সিঙ্গার সেলাই মেশিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি সকালবেলার সব কাজের শেষে আমাদের সেই তরুণী মাকেও। তখন পুজোর জামার কোন কনসেপ্ট তৈরি হয়নি মনে। নতুন জামার থেকেও গুরুত্ব ছিল মায়ের তৈরি এবং সেটা বেশ গর্বের বিষয় ছিল।

আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে কলকাতা নয় (৯) এ।রাস্তার নাম পাল্টেছে মাত্র। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের বাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রীটে চলে যাই।
তখন পুজো আসতো সাদা কাপড়ে রাস্তা জুড়ে টাঙানো সর্বজনীন দুর্গাপুজো লেখার হাত ধরে। শহর কলকাতায় শিউলির গন্ধ দুষ্প্রাপ্য হলেও আমাদের বাড়ির এক চিলতে বাগানে শিউলি ফুটতো। আকাশের আশ্চর্য নীল আর ধপধপে সাদা রঙের মেঘ দেখতে শেখা সেই তখন থেকেই, ধানের ক্ষেতের রৌদ্র ছায়াও।মা গুনগুন করে খুব নরম গলায় গাইতেন 'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে ', জানতে চাইতুম 'শারদ ' মানে কি গো মা?
- শরৎ কাল। পুজো হয় যে। দুর্গা পুজো।
মা দুর্গা বাপের বাড়ি আসেন,ছেলেমেয়েরা তাদের মামারবাড়ি।
আর বাবা, শিবঠাকুর ?
তিনি আসেন না।এই কদিন মা দুর্গার ছুটি।'
ভাগ্যিস আমাদের মামারবাড়ি ছিল উল্টোদিকের ফুটপাতে। তাই মামারবাড়ি যাওয়া ছিল রোজই। দূরে হলে বাবাইকে ছেড়ে কতদিন আলাদা থাকতে হতো !

|| ছোটবেলার পুজো ||

ঊর্মিমালা বসু

আমাদের বাড়ি বড় রাস্তার ওপরে হলেও, বাড়ির ঠিক সামনে কোন দুর্গা পুজো হোতনা , আশপাশে হোত । তখন তো এতো পৃষ্ঠপোষক ছিল না সর্বজনীন পুজোর, তাই পুজো প্রাঙ্গন ছাড়া রাস্তার বেশিটাই অনালোকিত থাকতো। মাইকে গান বাজতো,অপূর্ব সব বাংলা গান। সেই গানেই চারদিকটা আলোয় আলোয় মাতোয়ারা হয়ে উৎসবটা কেমন বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে অচেনা , অজানা ঢেউ তুলতো।আনন্দের পাশাপাশি মন খারাপের হিল্লোল।

ছোটবেলার পুজোয় শিউলি ফুল ফোটার মতই পুজো তথা উৎসবের আরেকটি সূচক ছিল রেডিওর মহালয়া। সেই একটু শিরশিরে, শীত শীত ভোরে মা সবাইকে ডেকে তুলে রেডিওর সামনে বসাতেন। একই ঘরের একটি কোণায় মাটিতে আসন পেতে বাবাই তর্পণ করতেন। বুবু, বুয়া ঘুম চোখে দোদুল্যমান অবস্থায় মহালয়া শুনতো । আমি বাবার কাছে বসে পুজোর এটাসেটা এগিয়ে দিতুম।মহালয়া শেষ হলে ,অনেকটা দুধে মিছিমিছি চা মিশিয়ে আমরা বছরে একদিন চা খেতুম, শুরু হয়ে যেত উৎসব।

মহালয়ার বিকেলে কোন কোন বছর বাবার সঙ্গে আমরা তিন ভাইবোন,আমাদের ছোটবোন তখনো জন্মায়নি জামা কাপড় কিনতে যেতুম। কোন কোন বছর কেন?এ প্রশ্ন উঠতে পারে।বাবা বিশ্বাস করতেন কোন ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। পুজোর জামা কাপড়ে তো নয়ই। কোন বছর যদি বাবা দিতে না পারেন! ছেলে মেয়েরা সেই কষ্ট যেন না পায়! কমলালয় থেকে দাদাদের জামা প্যান্ট কেনা হোত আর আমার ফ্রক চৌরাঙ্গীর ওপর পার্ক স্ট্রীটে ঢোকার একটু আগে 'গ্লোরিয়া ' থেকে পরে সেখান রাজস্থলী বলে একটি শো রুম হয়েছিল ইউ পি গভর্নমেন্টের। মায়ের শাড়ি আলাদা করে কিনতে দেখিনি,মা নিজেই কিনতেন। বাড়ির সহায়কদের বস্ত্রাদি ছাড়াও আরেকটি সওদা প্রতি বছর হোত একটি শাড়ি,পেটিকোট , ব্লাউজ আর চাদর বাবার এক বুড়িমার জন্য। তিনি বৌ বাজার অঞ্চলের কোথাও রাস্তায়



থাকতেন।পুজোর কদিন বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার রুটিনে অদ্ভুত সব ভাল ভাল অদল বদল হোত । মা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী না হলেও ,ঠাকুর দেখতে যাইনি এমন নয়। দমকল, মহম্মদ আলী পার্ক, সানকি ভাঙার অকালবোধন এই তিনটি ঠাকুর প্রতি বছর দেখতুম , নতুন জুতোর ফোস্কা সমেত।বিজয়ার চিঠি লেখা এবং প্রণাম করতে যাওয়াও পুজোর একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।
এরপরই লক্ষ্মীপুজো মামার বাড়িতে আর কালীপুজো পাড়ায়, সে এক হৈহৈরৈরৈ কাণ্ড।

আমাদের ছোটবেলার পুজোয় আচার বিচারের চেয়ে শিউলিফুল ফোটায়, শরতের আলোতে সুন্দরের আবাহনে,পারিবারিক সম্মেলনে মাতামাতি ছিল বেশি। পুষ্পাঞ্জলি বা সিঁদুরখেলা নিয়ে পারিবারিক স্তরে উথাল পাতাল ছিলনা। নিয়ম করে তর্পণ,আকাশ পিদিম জ্বালানো ছিল আর ছিল মস্ত করে ভাইফোঁটা।
এর পরের পুজোর গল্পের সময় আমার ছোটবেলা কেটে গেছে,সে সব কথা তাই 'অন্য কোথা , অন্য কোনখানে।'

Ernestina Morrissey

Ketaki Dutta | High Schooler and writer



A 132 years old vessel made my fifteenth birthday memorable! From the bottom of my heart, I thank Madhubani auntie for giving me the opportunity to board such a unique lifetime experience. It was not just a STEAM program but an adventure that allowed young women across New England to socialize, even through times of handling heavy work and learning to live with limited resources.

When we arrived at the New Bedford ship terminal, I was recovering from a random argument I had with my dad about convincing him that three doses of eye drops were enough for three nights. But everything simmered down when we noticed the one and only Ernestina Morrissey's mast standing tall at the port, the water surrounding it looked like hundreds of diamonds glimmering in the noon sun. My dad couldn't help but peel himself off and follow me to the schooner, it seemed to call him too. I soon found myself part of a circle mixed with kids from everywhere in Massachusetts. Amongst them was a girl I will never forget being friends with, Juno. She has a quiet voice that sounded so rare that when everybody was off chatting loudly with the crew, or clanging dishes in the kitchen, her voice helped me think, journal, and live in the moment.

My favorite crew members were Gus and Frankie. They were both deckhands, controlling the sails and safety equipment. They might be a decade older than us, but their way of talking just felt like bickering with my cousins back in India. The schooner's creaking and swaying resembled the breathing of a human body. Sway to the left, inhale, Sway to the right, exhale. The stairs down to the fish hold was really a ladder made of polished oak wood, which made hitting my head on the low hood much more teeth gritting!

BEST TAEKWONDO
GRANDMASTER'S SCHOOL
QUINCY, MA

Build confidence. Discipline. Strength.

A positive path to fitness, focus, respect and self-confidence.



Kids | Teens | Adults | Ages 4+

ITF & World Taekwondo (WT)

Self-Defense • Fitness • Discipline • Respect

FREE TRIAL CLASS
Try your FIRST class FREE!

403 Hancock St, Quincy, MA 02171 | (617) 481-6404 | besttaekwondo777@gmail.com | besttaekwondo.org

---

LISA'S DANCE STUDIO
Teaching Quincy to Dance Since 1987

ONE FREE TRIAL CLASS
Try it. Love it! ♡

Dream Learn Dance Grow ♡



Dance • Confidence • Creativity • Technique

- Ballet
- Pointe
- Tap
- Jazz
- Lyrical/Contemporary
- Hip-Hop
- Commercial Dance
- Musical Theatre
- Ballroom

Boys & Girls Ages 3–18 • Adult Classes Available

Dance Teams • Performance Opportunities

101 Adams Street, Quincy, MA 02169 | (339) 788-7700 | DanceStudioMail@aol.com | www.lisasdancestudio.com

Ernestina Morrissey

Ketaki Dutta

The fish hold once carried an impressive amount of fish, considering the lack of technology back from the 1890s. I realized what a fool I was for bringing a large-size hunk of a suitcase with me for the trip out of precaution when I saw the two feet wide slot and clearance for it in my bunk. One peculiar thing about this schooner was that there were at least two fire extinguishers in every room, even inside the bunks. The galley was unimaginably narrow. If I opened the cutlery drawer halfway, it would touch the oven handle. The space was cramped, but organized. Rolls of tape and game pieces were tucked away in plastic containers while plastic coolers held the things that the freezer had no space for. People needed to walk on top of the narrow benches and the coolers in order to reach their bunks on the other side. I bet they felt like pro gymnasts.

Our first task after exploring the ship was to set the sails. There were three of them we had to handle: The Mainsail, the Foresail, and the Jib. The Mainsail was the largest and hardest to set, reaching the size of a basketball court. When setting up these sails the captain says. “Hands to the mainsail!” and the crew would repeat with a loud but determined tone, “HANDS TO THE MAINSAIL!!”. There were two parts of the sail we had to consider when lifting it up, the throat and the peak. The throat was heavier, while the peak took longer to set. Engineer Avery hilariously claimed that it would be a two-way challenge either way. I positioned myself in a combat position, the rope stretching away from the mast inward diagonally. Both hands grabbed the rope, and everyone started chanting, “Heave! Huh!” I didn’t realize my face became a squinched expression, my knees creaked like the schooner, and my hands were red and scraped from my intense grip of the rope’s pattern.

The boat left for the bay, bound for Provincetown. When our ship anchored, vintage soft-serve ice cream parlors, posters of seagulls wearing ski goggles, and thrift shacks all went by us in a blur of unforgettable memories.

The breeze softened as the sun went down, and our cook, Mckenzie, brought my favorite spaghetti in large aluminum pans. The sauce tasted like fresh cut oregano with a hint of the sea salt blowing in the wind. Before I could take a second serving of the bliss, the pans were wiped clean by hungry students.

After dinner, we interviewed the crew. I realized that most of them chose working with historical ships because they were so connected to their own hobbies. I discovered Adrian was a latino tailor who worked with middle and working class clothing. He thought that expensive clothes are always valued and seen, but middle-class clothing really told a person’s merit and story. Old vessels might have less luxury and amenities, but they were easier to feel, and to connect to. We anchored under a sky full of stars for the night. The smog of our suburban town reflected the light from streetlamps making the sky look pale, but here, it was worth taking a rest and lying down on our sore backs to enjoy the speckled art from light years away. There were many constellations on site, Leo, the summer triangle, and The Big Dipper. Juno said beside me,

“Hey Ketaki, who decides to name these stars? Religion? The government? Scientists? Philosophers? I just think they’re beautiful as they are”.

“You’re darn right Juno”, I responded.

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান | বৈজ্ঞানিক এবং লেখক



শরৎ এলে বাঙালির মনে প্রথম যে ছবিটি জেগে ওঠে, নীল আকাশে সাদা মেঘ, ভোরের ঘাসে শিউলি, দূরে কাশবন, নতুন জামার অদ্ভুত গন্ধ, পাড়ার মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা, আর কোথাও থেকে ভেসে আসা ঢাকের প্রথম বোল। বাংলার বহু মানুষের কাছে দুর্গাপূজা ধর্মীয় আচারের সীমা বহু আগেই অতিক্রম করেছে। এ যেন একটি ঋতুর নাম, শৈশবে ফিরে যাওয়ার নিভৃত দরজা, বছরের ক্যালেন্ডারে কয়েকটি দিন যখন পরিচিত পৃথিবীটিও হঠাৎ একটু অন্য রকম হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই চিরচেনা শারদোৎসবের ইতিহাসের ভিতরেই লুকিয়ে আছে বিস্ময়।
যে দুর্গাপূজাকে আমরা প্রায় অনাদি এক বঙ্গীয় উত্তরাধিকার বলে অনুভব করি, তারও ইতিহাস আছে, তার আজকের সামাজিক রূপও একদিনে তৈরি হয়নি। রাজবাড়ির আচার, জমিদারি প্রতিপত্তি, লোকবিশ্বাস, সাহিত্য, সংগীত, মেলা, বারোয়ারি আয়োজন, নাগরিক মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ, নতুন পোশাক, আলোকসজ্জা, পুজোসংখ্যা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে ঠাকুর দেখা, সব একই শতাব্দীর সৃষ্টি নয়। সব মিলিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পূজা হয়ে উঠেছে উৎসব।

ধর্ম তাকে দিয়েছে আচার।
সমাজ দিয়েছে অভ্যাস।

উৎসব শুধু শাস্ত্র থেকে জন্ম নেয় না; মানুষের জীবনও তাকে নির্মাণ করে।

বাংলার উৎসবের গভীরে তাই আছে পাশাপাশি বসবাস, নেওয়া-দেওয়া, সংঘাত ও সমঝোতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা; কখনো এমন কিছু, যার উৎস কয়েক প্রজন্ম পরে আর কেউ মনে রাখে না।
এইখান থেকেই শুরু হয় আমাদের গল্প।

দুটি উৎসবের গল্প।
দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মবিশ্বাসের গল্প।

এবং শেষ পর্যন্ত, একটি বাংলার গল্প।

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান

এই দীর্ঘ সাংস্কৃতিক প্রবাহের দিকে তাকালে দুটি ধর্মতাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ পৃথক উৎসব, দুর্গাপূজা ও ঈদ, আমাদের সামনে একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন জাগে। তাদের ধর্মীয় উৎস আলাদা, আচার আলাদা, বিশ্বাস আলাদা; কিন্তু বাংলায় তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা লৌকিক আনন্দের ভাষায় কি একই ভূখণ্ডে দীর্ঘ সহাবস্থানের কোনো ছাপ নেই?

উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথম বিস্ময়টি অপেক্ষা করে আমাদের অতি পরিচিত রামকথাতেই।
বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ-এর যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবধের আগে রামচন্দ্রের শরৎকালে দেবী দুর্গার সেই পরিচিত "অকালবোধন" নেই। সেখানে যুদ্ধের এক সংকটময় মুহূর্তে ঋষি অগস্ত্য রামকে শোনান "আদিত্যহৃদয়" (আদিত্যহৃদয়ম্), সূর্য বা আদিত্যের বন্দনা। সেই স্তোত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে রাম আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।
অথচ বাংলার রামকথায় একদিন সেই রামই এসে দাঁড়ালেন শরতের দেবী দুর্গার সামনে।
পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝার নামে প্রচলিত শ্রীরাম পাঁচালী, যাকে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে জানি, নিছক সংস্কৃত মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ নয়। বাংলায় এসে রামকথা গ্রহণ করেছে এই মাটির লোকবিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ ও কল্পনার রং। বাল্মীকির রামের সূর্যবন্দনা আর বাংলার রামের দুর্গাবন্দনার ব্যবধান তাই শুধু ধর্মকাহিনির নয়; এর ভিতরে আছে সংস্কৃতির অসাধারণ অভিযোজন। একটি মহাকাব্য নতুন ভাষায় প্রবেশ করলে শুধু শব্দ বদলায় না, নতুন দেশের ঋতু, বিশ্বাস ও জীবনও তার মধ্যে বাসা বাঁধে। বাংলা রামায়ণকে তাই কেবল অনুবাদ করেনি; নিজের মতো করে আবার কল্পনা করেছে।
আজ যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমরা পড়ি, তার পাঠ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাণ্ডুলিপি, আবৃত্তি, পুনর্লিখন ও মুদ্রণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে প্রচলিত পাঠের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি সরাসরি পঞ্চদশ শতকের কৃত্তিবাসের কলম থেকেই অপরিবর্তিত অবস্থায় এসেছে, এমন নিশ্চয়তা ইতিহাস দেয় না। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট: বঙ্গীয় রামায়ণ-পরম্পরাই রামের শরৎকালীন দুর্গারাধনাকে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্মৃতির গভীরে স্থাপন করেছে।

শারদীয় দুর্গাপূজার জাঁকজমকপূর্ণ জমিদারি আয়োজনের ইতিহাসে অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণের নামও কিংবদন্তির মতো জড়িয়ে আছে। তাঁর বিপুল ব্যয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত, এমনকি ব্যয়ের অঙ্ক নিয়েও নানা বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সাল, অর্থের পরিমাণ এবং ঘটনার অনেক খুঁটিনাটি নিয়ে ঐতিহাসিক ঐকমত্য নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ, কৃত্তিবাসকে সাধারণভাবে পঞ্চদশ শতকের কবি হিসেবে ধরা হয়, আর কংস নারায়ণের পরিচিত ঐতিহাসিক অবস্থান অনেক পরের মুঘল যুগে। ফলে কংস নারায়ণ কৃত্তিবাসকে দিয়ে রামায়ণে অকালবোধনের কাহিনি সংযোজন করিয়েছিলেন, এমন জনপ্রিয় দাবিকে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যায় না।
কিংবদন্তি আর ইতিহাসের সীমারেখা সরিয়ে রাখলেও বৃহত্তর সত্যটি থেকে যায়। আজকের দুর্গোৎসব বহু শতাব্দীর সামাজিক সৃষ্টি। অঞ্জলির পাশে নতুন জামা, প্রতিমার পাশে শিল্প, পূজার পাশে সাহিত্য, আরাধনার পাশে পুনর্মিলন, সব স্তর একই সময়ে জন্ম নেয়নি। মানুষ উৎসবকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, নিজের সময়ের রং মিশিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়।
ঈদের বঙ্গীয় ইতিহাসের দিকে তাকালেও একই বিবর্তনের আর-একটি রূপ চোখে পড়ে।
ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআনে রমজানের সিয়ামের বিধান সুস্পষ্ট। ঈদের ধর্মীয় আচার ও রীতির বিস্তারিত রূপ আমরা প্রধানত হাদিস ও পরবর্তী ইসলামি ঐতিহ্যে পাই। কিন্তু ঈদকে ঘিরে নতুন পোশাক, উপহার, বিশেষ খাবার, গান, বাজার ও পারিবারিক মিলনের সামাজিক জগৎ সর্বত্র এক নয়। আরব, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া আর বাংলার ঈদ একই ধর্মীয় উৎস থেকে এলেও তাদের সামাজিক ভাষা স্বভাবতই ভিন্ন।
বাংলার ঈদের নিজস্ব সামাজিক ভাষা তৈরি হয়েছে বাংলারই ইতিহাসের ভিতর।
বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, মুদ্রণ, গ্রামোফোন ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান নগরকেন্দ্র। একই সময়ে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের নতুন আত্মপরিচয়ও গড়ে উঠছিল।

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান

এখানেই ছাপাখানা, সংবাদপত্র, সাহিত্যসভা, নাটক, গ্রামোফোন কোম্পানি। এখানেই নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, ফরিদপুর, কুচবিহার, ঢাকা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ কিংবা চট্টগ্রাম থেকে আসা মানুষ একই আধুনিকতার ভিতর নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করছেন।এ সময় পত্রপত্রিকা, সাহিত্য, সংগীত এবং প্রকাশনার জগতে মুসলমান লেখক-সম্পাদকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; উৎসবও ক্রমে সেই নতুন নাগরিক সংস্কৃতির ভাষা পাচ্ছিল।

এই ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর একটি তৈরি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দিন আহমেদের হাতে।

আব্বাসউদ্দিন চেয়েছিলেন বাংলায় ইসলামি ভাবধারার গান রেকর্ড হোক। সেই প্রচেষ্টার সূত্রেই নজরুল লিখলেন সেই গান, যার প্রথম কয়েকটি শব্দ আজও ঈদের আগমনী সুরের মতো বাঙালি মুসলমানের স্মৃতিতে বাজে: "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"। গানটি ১৯৩১ সালে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে রেকর্ড হয় এবং ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঈদের আগে গ্রামোফোন রেকর্ড হিসেবে প্রকাশিত হয়। অল্প সময়েই তা কেবল একটি গান রইল না; বাংলা ভাষায় ঈদের আবেগ প্রকাশের এক স্থায়ী সাংস্কৃতিক চিহ্ন হয়ে উঠল। গ্রামোফোনের ঘূর্ণায়মান কালো রেকর্ডে ঈদের সুর পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে; ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুভূতিকে বাংলা গান দিল নতুন এক সমষ্টিগত ভাষা। বাঙালি মুসলমানের ঈদ যেন নিজের একটি আগমনী গান পেল।

এই তুলনাটি ধর্মতাত্ত্বিক নয়।
সাংস্কৃতিক।

কারণ বাংলায় উৎসব আসার আগে তার আগমনের শব্দ শোনার একটি দীর্ঘ অভ্যাস ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল।
কোথাও ঢাক।
কোথাও গান।
কোথাও বাজারে নতুন কাপড়ের ভিড়।
কোথাও শিশুর অপেক্ষা।

দুই উৎসবের ধর্মীয় শিকড় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাদের বিশ্বাস ও আচারও স্বতন্ত্র।
কিন্তু ধর্মের শিকড় আর সামাজিক উৎসবের ডালপালা একই জিনিস নয়।
বাংলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান একই হাটে কাপড় কিনেছেন, একই নদীতে নৌকা চালিয়েছেন, একই বর্ষায় ঘর বাঁচিয়েছেন, একই দুর্ভিক্ষে অনাহার দেখেছেন, একই ভাষায় সন্তানকে ঘুম পাড়িয়েছেন।

তাদের উৎসবের লৌকিক জীবনে একে অন্যের কোনো ছায়াই পড়েনি, এমন ভাবাটাই বরং ইতিহাসের পক্ষে অস্বাভাবিক।
প্রভাব মানেই নকল নয়।
সংস্কৃতি অনেক সময় ধার নেয় কোনো ঘোষণা ছাড়াই।
কখনো খাবার।
কখনো পোশাক।
কখনো একটি শব্দ।
কখনো আনন্দ করার একটি ভঙ্গি।
তারপর কয়েক প্রজন্ম কেটে গেলে কেউ আর মনে রাখে না কোনটি প্রথম কার ছিল।

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান

তারপর এল ১৯৪৭।
একটি কলমের রেখা বাংলার শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল।
মানচিত্র বদলে গেল।
রাষ্ট্র বদলাল।
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে হঠাৎ নদীর ওপার হয়ে গেল অন্য দেশ।

যে মানুষ সকালে প্রতিবেশী ছিল, ইতিহাসের এক সিদ্ধান্তে সে-ই হয়ে গেল সীমান্তের ওপারের মানুষ।
কিন্তু মানুষের অভ্যাস কি মানচিত্রের কালিতে এক রাতে মুছে যায়?

দুই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্ন পথে হাঁটল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে উৎসবের কিছু মানবিক ব্যাকরণ দুই দিকেই থেকে গেল পরিচিত।

নতুন পোশাক।
বাড়ি ফেরা।
আত্মীয়ের অপেক্ষা।
বিশেষ রান্না।
শিশুর জন্য লুকিয়ে রাখা উপহার।
উৎসবসংখ্যা।
গান।

আর বহুদিন পরে দেখা মানুষের মুখ।
একদিকে মহালয়ার ভোর।
অন্যদিকে ঈদের চাঁদ।
দুটি বিশ্বাস।

কিন্তু অপেক্ষা করার অনুভূতিটি আশ্চর্যভাবে চেনা।
আসলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কখনো একমুখী নয়।

আমাদের ওয়াড্রোব থেকেও ইতিহাস বেরিয়ে আসে। শেরওয়ানি, চাপকান, পায়জামা কিংবা নানা দরবারি পোশাকের বিবর্তনে মধ্য ও পশ্চিম এশীয় এবং পারসিক-মুসলিম সংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে; উপমহাদেশে এসে সেগুলিও স্থানীয় বস্ত্র, কারুকার্য ও রুচিতে নতুন রূপ পেয়েছে। একই ঘটনা ভাষা, খাদ্য, সংগীত ও স্থাপত্যে। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ কিংবা ইংরেজি থেকে আসা অসংখ্য শব্দ আজ আর বিদেশি মনে হয় না। তারা বাংলা হয়ে গেছে।
সংস্কৃতির সবচেয়ে সুন্দর রহস্য সম্ভবত এখানেই: সে গ্রহণ করে, বদলে দেয়, তারপর একদিন উৎসের স্মৃতিটুকুও অতিক্রম করে আপন হয়ে ওঠে।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ সম্পর্ক শুধু সম্প্রীতির গল্প নয়। সেখানে ক্ষমতা ছিল, বৈষম্য ছিল, সংঘর্ষ ছিল, দাঙ্গা ছিল, দেশভাগের ভয়াবহতা ছিল। বাংলায় ইসলামের বিস্তার শুধু সুফি-দরবেশের শান্ত পদচারণার গল্প নয়, আবার কেবল তরবারি ও বিজয়ের গল্পও নয়। সামরিক অভিযান, রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসন, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক গতিশীলতা, ধর্মপ্রচার ও সুফি-দরবেশদের প্রভাব মিলিয়ে এটি দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস। কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও সমঝোতা; কোথাও ক্ষমতার চাপ, কোথাও নতুন জীবনের সম্ভাবনা।

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান

ইতিহাসের সত্য প্রায় কখনোই এক রঙের হয় না।
আর সম্ভবত সেই কারণেই বাংলা এত বিচিত্র। ঢাকের আওয়াজ তার পরিচিত, নজরুলের ঈদের সুরও তারই ভাষায় বাঁধা। ধর্মতত্ত্ব আলাদা; কিন্তু হাসি, নতুন পোশাক, রান্নাঘরের ব্যস্ততা, ঘরে ফেরা আর শিশুদের অপেক্ষার ভিতরে একই মাটিতে দীর্ঘ সহাবস্থানের ছাপ রয়ে গেছে।

আজ সেই মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে দাঁড়ালে কথাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিউ ইংল্যান্ডের শরতে কাশবন নেই। ভোরের বাতাসে শিউলির গন্ধও সহজে ভেসে আসে না।

ম্যাপল গাছের পাতা লাল হয়ে ওঠে অন্য এক ঋতুর নিয়মে।

তবু বস্টনের কোনো স্কুলের অডিটোরিয়াম, কমিউনিটি হল কিংবা মন্দিরে পুজোর সকালে ঢাকের প্রথম বোলটি উঠলেই অদ্ভুতভাবে দূরত্ব মুছে যায়।

কেউ ফিরে যান উত্তর কলকাতার গলিতে, কেউ কৃষ্ণনগর, বর্ধমান কিংবা হাওড়ার পুরোনো বাড়ির উঠোনে; আবার কেউ হয়তো ফিরে যান যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল কিংবা রাজশাহীর এমন কোনো বাড়িতে। কারও মনে পড়ে পাড়ার প্যান্ডেল, কারও মহালয়ার ভোর, কারও বাবার হাত ধরে নতুন জুতো কেনা, কারও মায়ের আলমারিতে তুলে রাখা পুজোর শাড়ি।
পাশে দাঁড়ানো বস্টনে জন্মানো শিশুটির হয়তো সেই বাংলার প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই।
অথচ তার নতুন জামা, অঞ্জলি আর বিস্মিত চোখের মধ্য দিয়েই স্মৃতি আর-এক প্রজন্মে পৌঁছে যায়।

পরিচয়ের সবচেয়ে স্থায়ী অংশগুলি মানচিত্রে থাকে না। তারা থাকে ভাষায়, স্বাদে, গানে, উৎসবে, স্মৃতিতে এবং মানুষের কাছে মানুষের ফিরে আসার অভ্যাসে।

তখন দুর্গাপূজার মণ্ডপে দাঁড়িয়ে একজন বাঙালি শুধু দেবীমূর্তির উপসনা করেন না;
নিজের হারিয়ে যাওয়া শরতের দিকেও তাকান।

পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ঈদের সকালে নতুন জামা পরা একটি বাঙালি শিশুর হাসিতেও বহমান থাকে সেই একই ভূখণ্ডের পারিবারিক আনন্দ ও মিলনের দীর্ঘ অভ্যাস।

উৎসবের সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা এখানেই। সে শুধু অতীতকে বহন করে না, অতীতকে নতুন মানুষের হাতে তুলে দেয়।

রাজা হারিয়ে যান।
সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।
মানচিত্রে সীমান্ত ওঠে।

কংস নারায়ণের বিপুল ব্যয়ের পূজা ইতিহাস না কিংবদন্তি, একদিন সেই তর্ক হয়তো গবেষকের পাতাতেই থেকে যাবে। কিন্তু নতুন জামার গন্ধ থেকে যাবে। ঢাকের প্রথম আওয়াজে বুকের ভিতর হঠাৎ কেঁপে ওঠা থেকে যাবে।

দুই উৎসব, এক বাংলা

আসাদ জামান

অতিথির জন্য তুলে রাখা খাবার, শিশুর হাতে উপহার, বহুদিন পরে দেখা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরা থেকে যাবে।
দুর্গাপূজা হিন্দুর ধর্মীয় উৎসব, ঈদ মুসলমানের।

তাদের স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই; বরং সেই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেই বাংলার বৃহত্তর সত্যটিকে দেখা যায়।
শতাব্দীর সহাবস্থানে মানুষ শুধু পাশাপাশি থাকে না, একে অন্যের কাছ থেকে অজান্তেই কিছু আলোও ধার নেয়।

ধর্ম আমাদের উৎসবের নাম দিয়েছে। ইতিহাস দিয়েছে তার রূপ।

আর বাংলা? বাংলা তাকে দিয়েছে হৃদয়।
তাই দেশভাগ পেরিয়ে, প্রজন্ম পেরিয়ে, মহাসাগর পেরিয়ে শরৎ যখন আবার আসে, আমরা শেষ পর্যন্ত শুধু একটি উৎসবের কাছেই ফিরে যাই না।
আমরা ফিরে যাই সেই আকাশের কাছে।
সেই গন্ধের কাছে।
শৈশবের কাছে।
স্মৃতির কাছে।
বাংলার কাছে।
এবং হয়তো, এত ইতিহাসের পরও,
একটু একটু করে,
একে অপরের কাছে।





Printing and Graphic Services

505 Middlesex Turnpike, Unit#7, Billerica, MA 01821

office: 978-667-6950

cell: 978-888-7496

(ask for Neelam Wali)

neelamwali@gmail.com

neelam.wali@printingandgraphicservices.com

www.printingandgraphicservices.com



অজ্ঞাতবাসে

শতভিষা মুখোপাধ্যায় | বৈজ্ঞানিক এবং কবি

বেশ কিছুদিন যেন
অজ্ঞাতবাসে আছি।

চেনা পৃথিবীর মধ্যেই
অসংখ্য খবরের অজ্ঞাতবাসে।

কি যেন একটা
সমাধান খুঁজছি।
সবার জন্য কোনো একটা
ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর সমাধান।

যে মানুষ সমাধান চায়
কিন্তু তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে
তার সমাধান।

যে মানুষের সমাধান আছে
অথচ সে চিনতে পারছেনা
তার সমাধান।

আলগা আলগা খবরে
ভেসে ভেসে
মানুষ যেন কোথাও আর
থিতু হতে পারছে না।

আসলে সবাই ডুবে আছে
অমোঘ এক অজ্ঞাতবাসে।

এ অজ্ঞাতবাস কাটবেই।

একদিন হুট্ করে রোদ ওঠার মত
প্রকৃতি থেকে নতুন সত্যের
সন্ধান পেয়ে।

তবে তা আসবে
তোমার আমার
সমাধান খুঁজে যাওয়ার
পাগলামিতেই।

২৮ সেপ্টেম্বর, ব্রুকলাইন

Chaye Garam...



Food Items

- Aloor Chop / Beguni : $3
- Fish Chop : $4
- Phuchka : 4 for $5
- Luchi with veg curry : 2 for $5 or 4 for $8
- Luchi plate (4 luchi, veg curry and gulab jamun) : $10
- Chicken Roll / Egg Chicken Roll : $10 / $12



Mishti

- Gulab Jamun : $2
- Rosogolla : $3



Beverage

- Cha : $2 per cup



Method of payment:

Cash • Venmo • Credit Card • Paypal

Show this for 1 free cup of tea

কামসূত্র মার্টিনি

মধুবাণী ঘোষ | শিক্ষিকা ও ছাত্রী



১৪৯৩ সালে, স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড আর রানি ইসাবেলার মদতপুষ্ট ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন পুয়ের্তো রিকোতে প্রথম পৌঁছন, তখন সেখানে বসবাস করত আরাওয়াক ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা। সেন্ট জনকে স্মরণ করে কলম্বাস এই দ্বীপের নাম দেন সান হুয়ান (San Juan)। পরে জলপথে বাণিজ্যসমৃদ্ধ বন্দর হিসেবে এর নাম হয় পুয়ের্তো রিকো অথবা 'Rich Port' অর্থাৎ সম্পদশালী বন্দর। ভাবতে অবাক লাগে যে, যে সময় কলম্বাস স্পেনের রাজশক্তির মদতে, দুর্জয় স্প্যানিশ আর্মাডা নিয়ে পুয়ের্তো রিকো এসেছিলেন, তার ঠিক পাঁচ বছরের মাথায়, ১৪৯৮ সালে, পর্তুগাল থেকে জলপথে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে নোঙর ফেলেন ভাস্কো ডা গামা। সকলেরই লক্ষ্য এক। নতুন উপনিবেশ পত্তন – নতুন আধিপত্য বিস্তার – নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দমন।

গতকাল ট্রলিবাস ধরে পৌঁছে গিয়েছিলাম এই অঞ্চলের প্রাচীনতম দুর্গে যার নাম কাস্তিলো সান ফিলিপে এল মোরো (Castillo San Felipe del Morro)। জলদস্যু আর অন্যান্য ইউরোপীয় রাজশক্তিকে পরাস্ত করতে এই দুর্গের গোড়াপত্তন হয় ১৫৩৯ সালে। একটু একটু করে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্গ নির্মাণের কাজ চলে প্রায় আড়াইশো বছর ধরে।

১৭৮০ নাগাদ রাজা চার্লস- এর তত্ত্বাবধানে নির্মাণ শেষ হয় এবং এই নিশ্ছিদ্র দুর্গের খেতাব হয় ডিফেন্স অফ দ্য ফাস্ট অর্ডার (Defense of the first order)। সমুদ্র যেখানে স্থল স্পর্শ করেছে সেখানে উঠেছে খাড়া পাথুরে পাহাড়ের টিলা। সেই টিলার মাথায় বহু মাইলব্যাপী অতন্দ্র প্রহরী এল মোরো দুর্গ। সে রক্ষা করছে এক বৈভবশালী বন্দরকে, যাকে বলা হতো গেটওয়ে অফ দ্য ক্যারিবিয়ান (Gateway of the Caribbean) । এল মোরোতে সর্বদা তৈরি থাকতো সাড়ে চারশ কামান। শয়ে শয়ে দুঃসাহসী স্পানিশ যোদ্ধা ঘর পরিবার থেকে বহুদূরে, রাজকীয় মর্যাদা আর সম্ভ্রম রক্ষা করতে, বছরের-পর-বছর কাটাতো এই দুর্গের টহলদারি করে।

ট্রলি থেকে নেমে দেখি এক বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের ওপরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বিশাল পাথরের দুর্গ। দুর্গের ওপারে গভীর খাদের তলায় নীলা-পান্নার গুঁড়ো মাখা সমুদ্র। প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই বিশাল চত্বর যেখানে সৈনিকরা রোজ কুচকাওয়াজের জন্য সমবেত হত। ঠিক মাঝখানে একটি বিশাল কুয়ো রয়েছে যেখানে এক বছরের মতো বৃষ্টির জল ধরে রাখা হতো। সাধারণ সৈনিকেরা থাকতো পাথরের তৈরি ছোটো ছোটো ঘরে আর আলাদা আরেকটু বড়ো ঘরে থাকতো উচ্চপদে আসীন অফিসাররা। বিশাল চত্বরের পাশে একটি প্রার্থনা কক্ষ সেখানে বিরাট তৈলচিত্রে রয়েছে সৈনিকদের পূজনীয়া ১৫৩১ সালে আঁকা আলেহো ফার্নান্দেজের (Alejo Fernandez) ভার্জিন অফ দ্য নেভিগেটর (Virgin of the navigator)। দেখলাম ভার্জিন দুই হাতে আগলে রেখেছে ক্রিস্টোফার কলম্বাস এবং অন্যান্য নাবিকদের। সামনে উত্তাল তরঙ্গে কয়েকটি জাহাজ ভাসছে। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে হয়তো এই প্রার্থনাকক্ষে এসে জমায়েত হত নাবিকের দল- একটু ভরসার সন্ধানে।

ধীরে ধীরে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে স্পেনের পরাক্রম অস্তমিত হল। পুয়ের্তো রিকো আর কিউবা ছাড়া, বেশিরভাগ স্পেনের উপনিবেশ ক্রমপর্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। স্পেনের রাজার স্মৃতি থেকে অপসৃয়মান হল এল মোরোর দুর্গ প্রহরীরা। ক্রমে ক্রমে সৈনিকদের রসদ ফুরিয়ে আসতে থাকে, বিশাল কামান গুলিতে জং ধরতে থাকে, সিফিলিস আর ডিসেন্ট্রি ছারখার করতে থাকে তাদের শরীর। ঘরবাড়ি থেকে বহুদূরে, রুগ্ন ভগ্নমনোরথ স্প্যানিশ আর্মাডার সৈন্যরা ভাবতে থাকে, ‘তবে কি রাজা আমাদের কথা ভুলে গেলেন?’ অবশেষে মার্কিন জেনারেল নেলসন মাইলসের (Nelson Miles) নেতৃত্বে, ১৮৯৮ সালে সান হুয়ান স্পেন থেকে হস্তান্তরিত হয় আর এল মোরো দুর্গে উড়তে থাকে মার্কিনী পতাকা।

কামসূত্র মার্টিনি

মধুবাণী ঘোষ

অনেকটা সময় নিয়ে সবকিছু মন ভরে দেখে যখন বাইরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটু হেঁটে শহরের রেস্তোরা অঞ্চলে পৌঁছে দেখলাম একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'শেফ রমেশ পিল্লাইস তন্ত্র'। ব্যাস আর কোনো কথা নেই! তন্ত্র নামের রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখি লালচে দেওয়ালে রাজস্থানী পিতলের আর কাঠের নকশা করা জানালা, কালো পাথরের গণেশ, দেওয়ালে ঝোলানো হাতপাখা, ইত্যাদি সাজিয়ে একটা ভারতীয় পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছেন শ্রী পিল্লাই। আবছায়া নরম আলো রয়েছে যাতে সকলকেই ভালো দেখতে লাগে। হালকা আওয়াজে পাঞ্জাবি লোকসংগীত শোনা যাচ্ছিল। টেবিলে বসতেই পরিবেশক আমার সামনে প্রথমে একটা ড্রিঙ্কস মেনু নিয়ে এলেন। সেটি দেখে আমি শ্রী পিল্লাইয়ের ব্যবসা বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। যেহেতু ভারতীয় খাবারের দোকান, তাই পানীয়ের নামে বেশ একটা প্রাচ্য রোমান্স এনেছেন তিনি। পনেরো রকম মার্টিনি রয়েছে মেনুতে – যার নাম হল তন্ত্র মার্টিনি, চিলি পেপার মার্টিনি, সেডাকশন মার্টিনি, কার্ডামম স্পাইস মার্টিনি, কামসূত্র মার্টিনি ইত্যাদি! পরিবেশককে বেশ খানিকটা নিরাশ করে বললাম, 'এ গ্লাস অফ ওয়াটার উইথ ওয়ান কিউব অফ আইস প্লিজ!' তবে বলার কায়দা দেখে মনে হবে যেন ০০৭ রুপী শন কনারি মার্টিনি অর্ডার করে বলছেন 'শেকেন নট স্টার্ড' (shaken not stirred)!

খাবার মেনুতে নানারকম নামের কায়দা অতিক্রম করে বেশ ছাপোষা গোছের চিকেন কারি উইথ বাসমতি রাইস খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। তবে শ্রী পিল্লাই ভাত পরিবেশন করেছে একটা চমকপ্রদ পাঁপড়ের তৈরি বাটিতে। বিল মিটিয়ে পরিবেশককে বললাম 'শ্রী পিল্লাইয়ের সাথে একটু দেখা করা যাবে কি?' খানিক বাদেই এক ভারতীয় ভদ্রলোক কালো শার্ট, জিন্স আর কালো এপ্রন পরে এসে দাঁড়ালেন। আমি রান্না আর রেস্তোরাঁর প্রশংসা করে নমস্কার জানিয়ে চলে আসব তখন উনি বললেন, 'একটু বসে যান, এক্ষুনি আমাদের নাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে।' আমার তেমন ফেরবার তাড়া ছিল না আর তাছাড়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভারতীয় নাচের অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়াটাও তো কম কথা নয়।

ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়লো। ক্রুজ জাহাজের মার্কিনি পর্যটকেরা দলে দলে রেস্তোরাঁয় এসে টেবিলগুলো ভর্তি করতে লাগলেন। হঠাৎ বেশ একটা জগঝম্প বাজনা বেজে উঠলো আর মনোমোহিনী পোশাকে এক জন নর্তকী সেই বাজনার তালে তালে টেবিলের পাশ গুলোতে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করলেন। নর্তকীর পোশাক এবং ধরনধারণ অনেকটা গুরু সিনেমার মল্লিকা শেরাওয়াতের মতো। সিনেমায় ধীরুভাই আম্বানি ওরফে গুরুরাজ যখন তুরস্কে গিয়েছিলেন তখন এই ধরনের একটা নাচের দৃশ্য দেখেছিলাম বটে। মার্কিনিদের ভূগোল জ্ঞান এমনিতেই বেশ সীমিত। তার ওপরে গোটা পাঁচেক কামসূত্র মার্টিনি খেয়ে তারা যে তুরস্ক আর ভারতবর্ষ গুলিয়ে ফেলবে সে আর এমন কী! পর্যটকেরা উল্লসিত হয়ে ঔপনিবেশিক ডলার গুঁজে দিচ্ছিলেন নর্তকীর শরীরে।

জাহাজে ফিরে ঘুম আসছিল না অনেকক্ষণ। কেবিনের নরম আলোয়, কামসূত্র মার্টিনিতে আলতো চুমুক দিয়ে খোশমেজাজে গল্পে মশগুল মল্লিকা শেরাওয়াত আর স্পেনের রাজা চার্লস। রাজা ভুলে গেছেন এল মোরোর দুর্গ প্রহরীদের কথা – ভুলে গেছেন আড়াইশো বছর ধরে তিল তিল করে তৈরি ডিফেন্স অফ দ্য ফাস্ট অর্ডারকে। দরজার বাইরে ত্রস্ত, কুণ্ঠিত প্রহরী আলতো টোকা দিয়ে গেল রাজার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়। বর্তমানে অনুরক্ত রাজাকে আলতো টোকা দিয়ে গেল অতীত...

'আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

মা-দুরে মা দুর্গা

তিমির মণ্ডল | প্রযুক্তিবিদ এবং লেখক



সে অনেক দিন আগেকার কথা। সময়টা ঠিক মনে নেই, তবে বছর তিরিশ তো হবেই। তখন ছেলেটি হয়তো ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ে।সেদিন তার মা হাটে গিয়েছিল কিছু পেঁপে, কাঁচা কলা আর কুমড়ো নিয়ে। সেগুলো বেচে ঘরের বাজার, তেল-ঝাল-মশলা কিনে আনবে, অন্যান্য বারের মতো।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, প্রতি মঙ্গলবার আর শুক্রবার হাট বসত তাদের পাশের গ্রাম জোতেঘনশ্যামে। বাগনান, কোলাঘাট, পাঁশকুড়া থেকে প্রায় সমান দূরত্বে, ২০-২৫ কিলোমিটার হবে। গ্রামটিতে মূলত চাষবাসই হতো। ধান, ফুল আর বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি। দূরের গ্রাম থেকে প্রায়ই বিভিন্ন ফেরিওয়ালা আসত সেখানে।

সেদিনও একজন ফেরিওয়ালার গলা হঠাৎই শুনতে পেল ছেলেটি।

“মাদুর লেবে গো... মাদুর...”

এই মাদুরওয়ালারা আসত বেশ দূর থেকে—সেই পূর্ব মেদিনীপুরের পিংলা, সবং, দাঁতন, ওই সব জায়গা থেকে। ছেলেটির গ্রাম নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে।

হঠাৎই তার মনে পড়ল, কদিন আগেই মা বলছিল, সামনে দুর্গাপুজো আসছে। বাড়িতে যদি কুটুম-স্বজন আসে, বসতে দিতে একটা ভালো মাদুর কিনতে হবে। তাদের আগের মাদুরটার দড়িগুলো পচে গিয়ে কাঠি খুলে খুলে যাচ্ছিল। তাই ওটা আর সেভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না।

লোকটা অনেকগুলো মাদুর রোল করে মাথায় করে আনছিল, আর কাঁধে ঝোলানো ছিল কিছু আসন মাদুর। পাড়ায় ঢোকার পর বেশ কয়েকজন জড়ো হলো মাদুর দেখবে বলে।

এদিকে মা এখনও হাট থেকে ফেরেনি। ছেলেটির বেশ অস্থির লাগছিল, পাছে মাদুরওয়ালা চলে যায়!

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হঠাৎই মাকে দেখতে পেল সে, অনেকটা দূরে। মাথায় আর হাতে বেশ ভারী ব্যাগ। মাকে দেখেই খুশিতে ছুটে গেল তার দিকে। মা আজ বাজার থেকে অনেক কিছু কিনে এনেছে।

মায়ের হাত থেকে একটা ভারী ব্যাগ নেওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মা বলল, “এত ভারী, এটা তুই নিতে পারবি না...”

ছেলেটি মা কে ঘিরে এদিক ওদিক থেকে হাটতে হাটতে বলল, “মা, মাদুরওয়ালা এসেছে, মাদুর নেবে তো?”

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, “পায়ে পায়ে যাস না তো... ঘর চল।”

ছেলেটি বুঝতে পারল না, মা কেন খুশি নয়।

বাড়িতে গিয়ে ব্যাগগুলো নামানোর পর দেখা গেল, বেচতে নিয়ে যাওয়া পেঁপে আর কলাগুলো ফিরে এসেছে। সবগুলো বিক্রি হয়নি। যা বিক্রি হয়েছিল, তা দিয়ে কিছু বাজার করে এনেছে মা।

সংসারের হিসেব সে বুঝত না। টাকার অভাব বলতে কী বোঝায়, তা-ও এতটা জানত না।

তার মাথায় তখনও শুধু মাদুরটার কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ভয়ে ভয়ে আবারও বলল,

“মা, মাদুর কিনবে না? তুমি তো বলেছিলে।”

মা কিছু বলল না। একটু চুপ করে বসে রইল। তারপর খুব আস্তে বলল, “কত করে বলছে রে?”

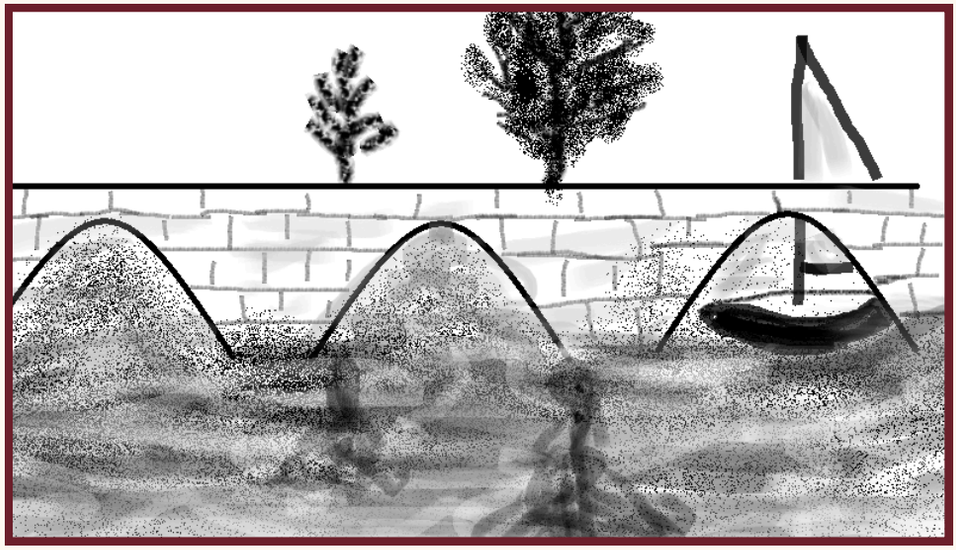
মা-দুরে মা দুর্গা

তিমির মণ্ডল

কথাটা শুনে ছেলেটির চোখ খুশিতে ভরে গেল, তত্ক্ষণাৎ বলে উঠল , “জানি নি... তুমি চলো... জিজ্ঞাসা করবে।” মায়ের হাত ধরে আবার তাকে টেনে নিয়ে গেল মাদুরওয়ালার কাছে।
মা জিজ্ঞেস করল, “কত করে দিচ্ছ গো?”
লোকটা বলল, “এই দু-মাথা মাঝারি মাদুর আশি টাকা জোড়া। একটা নিলে পঞ্চাশ।”
“না, দুটো নয়, কমসম করলে একটাই নেবো,” মা বলল।
মা যখন দরকষাকষি করছে, তখন ছেলেটির চোখে পড়ল, সাধনদের দুটো বড় মাদুর কিনেছে।
সে মাকে জিজ্ঞেস করল, “মা, ওই সাধনদের মতো মাদুর কিনবে?”
মা বলল, “অত বড়ো মাদুর নিয়ে আমরা কী করব? লাগবে না।”
মনটা একটু খারাপ হলো তার। কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিল, বাকি অন্যান্য সব বারের মতো।
যাই হোক, শেষমেশ লোকটি বলল, “একটা মাদুর আমি ৩০ টাকার কমে দিতে পারব না।”
মা বলল, “আমার কাছে সত্যি এত টাকা নেই, ২০ টাকা আছে। আর যদি চাও, বাকি টা কিছু সবজি, মানে পেঁপে আর কাঁচা কলা দিতে পারি।”
লোকটি বলল, “আচ্ছা, তাই দাও...” ,একটু ইতস্তত হয়ে লোকটি আবার বলল, “অনেকটা বেলা হয়েছে, খুব খিদেও পেয়েছে। আমাকে একটু মুড়ি আর জলও দিও।”
মা বলল, “ঠিক আছে, তুমি বসো, আনছি।”
ছেলেটিও মায়ের পেছন পেছন ছুট দিল বাড়ি থেকে ওগুলো আনতে। লোকটাকে মুড়ি, শসা আর এক ঘটি জল দিল সে। খাওয়া শেষে মা তার আঁচল থেকে আট পাট করা একটা ২০ টাকার নোট, কিছু পেঁপে আর কাঁচা কলা দিল।
মাদুরটা নিয়ে মহাআনন্দে বাড়ির পথে রওনা দিল ছেলেটি।
তার উত্তেজনার কোনো শেষ ছিল না... হাতে যেন মোয়া পেয়েছে! কবে মাদুরটা খুলবে! কবে তার ওপর বসবে! কবে শোবে!
কিন্তু অপেক্ষা করতে হলো আরও সাত-আট দিন।
অষ্টমীর ব্রত শেষে সন্ধ্যায় মা বাড়ি ফিরে আসার পর মাদুরটা বিছিয়ে বসেছিল সে। লাফাচ্ছিল, শুয়ে পড়ছিল... শান্তি... অপেক্ষার অবসান।
নতুন মাদুরের গন্ধ, তার বুননের খসখসে স্পর্শ, মায়ের কোল—সবকিছু মিলিয়ে সেদিন তার কাছে সেটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।
সেদিন সে বুঝতে পারেনি, একটা মাদুরের জন্য এত আনন্দ কেন হয়েছিল।
কিন্তু আজ সে বোঝে , আনন্দটা শুধু মাদুরে ছিল না। আনন্দটা ছিল মা , মাদুর আর মা-দুর্গা-র এক বিশেষ সম্মেলনে।
আজ তার মা অনেক দূরে চলে গেছে। রয়ে গেছে তাদের সেই মাদুর আর মা-দুর্গার স্মৃতি।
এ বছর যখন সে শুনেছিল, বোস্টন দুর্গাবাড়ি মাদুরের মাধ্যমে মাকে আহ্বান করছে, তখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল নিজের মা, সেই মাদুর আর মা দুর্গাকে ঘিরে থাকা এক সম্মিলিত স্মৃতি।
একটি ছোট্ট মাদুর, এক মুঠো মুড়ি, আঁচলে বাঁধা কুড়ি টাকার নোট আর এক মায়ের নিঃশব্দ ভালোবাসা—সব মিলিয়ে যেন ফিরে এসেছিল হারিয়ে যাওয়া এক শৈশব।
কিছু অপেক্ষার শেষ হয়, কিন্তু কিছু স্মৃতি কখনও শেষ হয় না।

Fred

Soumyarwit Manna | Scientist by profession, cook by choice, traveler by ambition



Travel stories are perhaps what I relate to the most. Traveling is my passion and I consider myself incredibly fortunate to have witnessed some of the extremes of this beautiful blue planet—from watching a live tiger devour its prey in Kanha National Park to meeting a man perfectly content with barely five months of sunshine above the Arctic Circle. This planet has a remarkable way of reminding us that survival often belongs to those who can adapt.

And then there is Fred.

Fred is a pine tree, a resident of Monroe County, Florida, and calls a section of the old, abandoned Seven-Mile Bridge in the Florida Keys his home. He is of Australian ancestry, believed to have sprouted from an accidental bird dropping.

A solitary tree growing out of a concrete structure for years, Fred has endured hurricanes, salt spray, the scorching Florida sun, and a life of almost complete isolation. And yet, he continues to stand tall. There is something wonderfully poetic about that – a living organism adapting to something as rigid, unforgiving and lifeless as concrete.

Fred isn't exactly easy to visit... You can reach the base of the old, abandoned bridge by boat, or you can merely slow down while crossing the current Seven-Mile Bridge and look toward the abandoned span. From there, Fred is just a tiny speck in the distance. But even from afar, he manages to make his presence felt; a small, stubborn reminder of resilience in an environment that seems determined to make survival difficult.

There is something beautiful about how the tree has turned its isolation into solitude, standing alone yet never seeming lonely.

HENEDY SHUTTLE & LIVERY

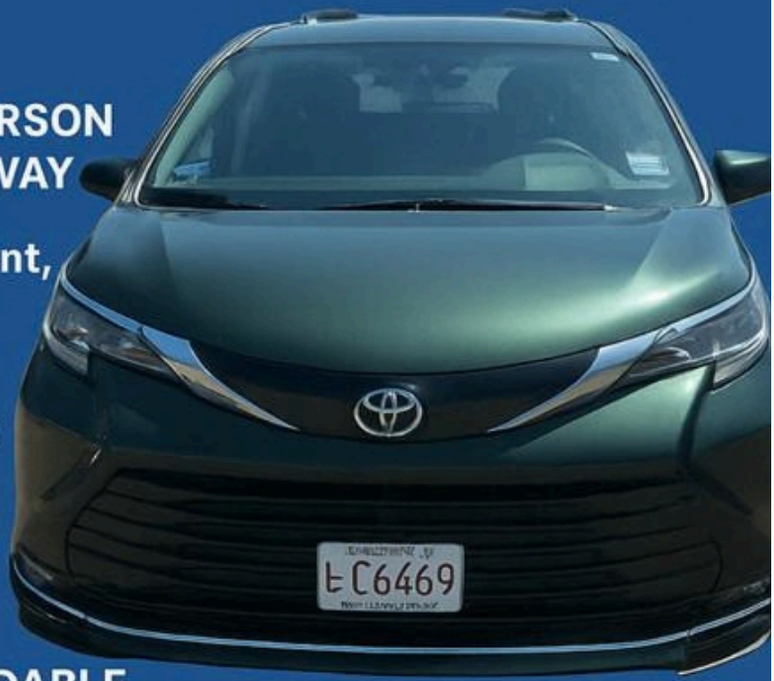
SERVING:

XFINITY CENTER CONCERTS | GILLETT STADIUM EVENTS
BOSTON LOGAN AIRPORT | TF GREEN AIRPORT

SKIP THE STRESS OF DRIVING & PARKING!

HEADING TO A CONCERT, SOCCER MATCH, OR GAME AT GILLETTE OR XFINITY? LET US GET YOU THERE AND BACK SMOOTHLY AND HASSLE-FREE.

$25 PER PERSON EACH WAY



- ✓ At the end of the event, shuttles will run for 2 hours
- ✓ Return rides are only for our dropped-off customers - no long waits!

CONVENIENT, AFFORDABLE, AND RELIABLE TRANSPORTATION WITH

HENEDY SHUTTLE & LIMOUSINE

CALL: 508-840-4343 FOXBORO M

Fred

Soumyarwit Manna

My first, very distant, encounter with Fred was in April 2019. My most recent one was in January 2026.

Seven years!

In those seven years, I moved cities, changed jobs, changed my entire ecosystem, and lived through a pandemic. I wonder if Fred ever realized that a tiny little bug called COVID-19 had turned the lives of some of his admirers upside down. Poor Fred has been practicing social distancing since the day his first leaf sprouted.

Perhaps what fascinates me most about Fred is that he seems to be the perfect protagonist for the age-old debate of nature versus nurture. Which matters more?

Or does it have to be that one has to win? Nature certainly seems to have taken care of Fred. In this case, nature has nurtured Fred over the years! I only wish someone had told him that he came from a beautiful land down under.

Now, he even has a young companion growing beside him. The two of them stand together on that forgotten bridge, quietly enjoying the spectacular Florida sunrises. There is something deeply human about that image.

In today's world, Fred feels like more than just a tree. He is a tiny beacon of hope and positivity, in many ways an example of a immigrant journey- thrown into an unfamiliar environment, forced to adapt, yet determined to grow, survive and stand tall with dignity.

Perhaps that is why I keep looking for Fred whenever I am in the Keys.

ServeSafe Certified

Allergen Certified

Mumbai Tiffin & Catering

Authentic Homestyle Tiffin Service

100% Vegetarian | Jain | Swaminarayan | Vegan Options Available



Menu Changes Every Week • Monday to Friday • New Vegetable & Dal Daily • No Repeat

Monday to Friday Tiffin Services & Weekend Party Catering Orders

Call / WhatsApp: 203-768-2290

www.mumbaicateringsandtiffin.com | Instagram: @mumbaitiffin

Scan for Menu & Ordering

The Strange Scare of the Chapati Relay

A Historical Fiction Retelling

Gouri Datta | Physician by profession, writer by passion

It was 1857.
The British had established themselves as the ruling class in India, and the embers of a slow-burning resentment were only faintly evident within the general Indian community.

The two Indian men ran through the night, their chappals making subdued hissing sounds on the grassy paths, the turbans on their heads turning moist with the sweat of exertion. They could have been farmers, postmen, or low-level night watchmen from the village—two Indians carrying a cloth bundle tied to one of their waists, hidden beneath their cotton kurtas, grimy with the dust of the roads.

What was their secret burden? What explained their hurry and urgency?

They had to reach the next village before dawn broke and pass the package on to the next village post. There was a rhythm to their actions. As they reached the barnyard of the next village, they would lean against the door, and with tired hands and short puffs of breath, the older of the two runners would open the cloth bundle tied with a rope to his waist.

What was in the bag?

Out would come the contents of the makeshift bundle, poured onto the rough-hewn wooden table. The Mukhiya, or leader of the village, bent his head and acknowledged the contents respectfully. They were five pieces of roti, unleavened bread made of wheat and cooked on an iron plate over a direct fire, staples of Indian meals.

“Take these five, and make five more,” the older runner chanted, as others before him had done. “And take the new five rotis to the next village in the chain.”

The Mukhiya knew the rule, as this had been repeated sequentially over the past two months: the transfer of rotis, or chapatis, from one village to another, a fresh batch to be carried like the victory baton in a race to the next post.

The roadside English policemen saw the Indian men huffing and puffing in desperate haste across the fields.

“Stop! Halt, kala aadmi!” the white policeman cried, using a racial slur.

The two new runners stopped without argument.

“This running about at night seems very suspicious. I will take you to the police station and place you in lockup. The Magistrate will see you in the morning.”
The policemen confiscated the bundle tied to the runner’s waist and placed it carefully on the
Magistrate’s desk to be examined appropriately by his superior in the morning

The Strange Scare of the Chapati Relay

Gouri Datta

When morning came, the Magistrate opened the bundle and was surprised to see five pieces of dryIndian bread.

“What is the meaning of this?” he cried vexedly.

“Only rotis to eat, sir,” answered the Indian runners, facing him not with defiance or fear, but wit intrepid calmness.

Later that afternoon, other police stations in the area had similar roti carriers placed in jail and badgered and questioned as to why they were running so urgently with their packages of five rotis each. The runners gave the same bland answer when interrogated about the reason for the roti transfers.

“We have orders to do this, sir.”
“Orders? From whom? Who would give an Indian man orders other than the British Raj?”
The English policemen struggled to get to the bottom of this strange behavior by the Indians. Have the Indians gone mad? Have they been poisoned with dhatura seeds? Was there an unknown conspiracy behind all this?

These questions began in the local police stations but gathered momentum and stirred great anxiety at the upper levels of the British administration. Many meetings were held discussing the matter. A multitude of letters were written describing the possible underlying conspiracy that might be brewing in Indian villages, farms, barracks, and elsewhere to overthrow the British colonizers.

Many of the British lost sleep over this. Others lost their appetite or ate and drank too much to compensate for their worries.
The then ruler of India, the East India Company, was asked to intervene. Several high-level meetings
generated no answer. The company recommended a ban on night travel, but that affected the delivery of produce and coal by bullock carts overnight, so it had to lift the ban.

Thus, the mystery and aggravation for the British remained, and no solution was found. Meanwhile, the transfer of rotis continued throughout many parts of the Indian subcontinent. The time of delivery changed to the daytime. Since it involved innocuous items like Indian flatbreads, the British could not call it a crime or ban the action.

On the other hand, the Indians derived great satisfaction in having caused turmoil and distress among the colonizers by means of this nonviolent ploy to literally “play with the others’ minds.” This was a small victory, but still a bull’s-eye against Goliath, achieved without bloodshed.

The roti, or chapati, relay went on for several months during the first part of 1857. It baffled and confused the British administrators. The chapati relay was one of several small ploys by Indians to fight back by creating fear and rumors among the British. It was considered a prelude to the strong and terrible Indian uprising known as the Indian Rebellion of 1857. It was also an example of the valor of the early freedom fighters of India.

॥ ঘরে ফেরা ॥

প্রসেনজিৎ মন্ডল | বৈজ্ঞানিক এবং লেখক

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজতে চললো, এখনও মেয়ের বাড়ি ফেরার সময় হলো না! সেই কোন সকালে বেরিয়েছে, দুপুরে কিছু খেয়েছে কিনা তারও ঠিক নেই। নিজের মনে কথা গুলো বলতে বলতে মেয়ে মিতাকে ফোন করলেন রমা।
"হ্যাঁ মা বলো" ফোনটা ধরেই মাকে বললো মিতা।
"কি রে মা, আজকে বাড়ি ফিরবি কখন? সাড়ে সাতটা বেজে গেলো তো!" কিছুটা বিরক্তি সুরেই মেয়েকে বললেন রমা।
"আর একটু দেরি হবে বেরোতে। আসলে আজকে বৈশাখীর নাইট ডিউটি আছে, কিন্তু ও এখনো আসেনি, তাই আমাকে মনে হয় ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আরো কিছুক্ষন থাকতে হবে।" বললো মিতা
"ও আচ্ছা! তাহলে বৈশাখী এসে গেলেই তুই বেরিয়ে পড়িস। একটা ক্যাব করে নিস্, আর সাবধানে আসিস মা!" মেয়েকে বললেন রমা।
"ঠিক আছে! তুমি সময়ে খেয়ে নিও, আমি ৯ টা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাবো।"
এমন সময় বাইরে কিসের একটা গোলমালের আওয়াজ শুনতে পেয়ে, "তুমি চিন্তা করোনা, মা " বলেই ফোনটা রাখলো মিতা। নার্সকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো,"বাইরে এতো গোলমালের আওয়াজ কিসের?"
"আসলে ম্যাডাম, ওই দমদম রোডে একটা দুর্ঘটনার জন্যে একসাথে অনেকে ইমার্জেন্সি তে চলে এসেছে, আর ওরাই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ।" নার্স বললো।
"চলোতো দেখি" বলেই আরো দুজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে এসে, করিডোরেই ওদের চিকিৎসা করতে লাগলো মিতা। কিছুক্ষন পরে আরো কয়েকজন হাউসস্টাফ হোস্টেল থেকে এসে ওদের কে সাহায্য করাতে সবার মোটামুটি একটা প্রাথমিক চিকিৎসা করা গেলো।
ঘড়িতে এখন রাত সোয়া ১২ টা বাজে, কিভাবে যে এতটা সময় পেরিয়ে গেলো ভাবতে ভাবতে নিজের কেবিনে এসে ফোনটা ড্রয়ার থেকে বের করে দেখতে লাগলো মিতা! "মায়ের ৯ টা মিসড কল, বৈশাখীর মেসেজ- আজকের নাইট ডিউটি টা একটু দেখে নিস্ প্লিজ। দিদির মিস ক্যারেজ হয়ে গেছে বাথরুমে পড়ে, আমি ওখানে যাচ্ছি এখন! কালকে ফিরে সব বলবো, বাই "
কি চিন্তা করে মিতা এতো রাতে আর বাড়ি না গিয়ে, তিনতলার কন্ফারেন্স রুমে চলে গেলো একটু বিশ্রাম নিতে।
কখন যে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি মিতা। হঠাৎ একটা খটকা আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেলো ওর। মনে হয় কে যেন গোঙাচ্ছে! একটা চাপা কান্নার আওয়াজ আসছে দেয়ালের ওপার থেকে, কিছুটা ঐদিকে এগিয়ে যেতেই কান্নার আওয়াজটা থেমে গেলো। এক অদ্ভুত নীরব শুন্যতা চারিদিকে, পরক্ষণেই সাদা ওড়না জড়ানো কিছু একটা যেন চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলো। হঠাৎ করেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো মিতার। ভয় না পেয়ে ধীর পায়ে ওই দিকেই যেতে লাগলো মিতা, দেখলো পাশের ওয়াশরুমে কেউ যেন কিছু একটা করছে!
ওয়াশরুমের ভিতরে গিয়ে একজন মেয়েকে দেখেই মিতা জিজ্ঞেস করলো- "এই মেয়ে, কে তুমি? এখানে কি করছো, ভিজিটর তো এলাও নয় এই সময়, তুমি এলে কিভাবে?"
"আমি তো এখানেই থাকি!" বললো মেয়েটি
"এখানেই থাকি মানে? তোমাকে তো আগে দেখিনি! তোমার নাম কি?" জিজ্ঞেস করলো মিতা।
"আমার নাম মৌ, তুমিতো মিতা! বেশ সুন্দর নাম!" মেয়েটি বললো ।
"মৌ? আগে এই নাম শুনেছি বলে তো মনে হয়না! আর তাছাড়া তুমি আমার নাম জানলে কি করে? বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করলো মিতা।
"আমি সবাইকে জানি এখানে, তোমার সুপার সিনিয়র এই কলেজে, অনেক আগের ব্যাচ! তোমার তো থার্ড ইয়ার কমপ্লিট হলো, এই বছর ফাইনাল।"
"হ্যাঁ, ফাইনাল ইয়ার, তাই অনেক চাপ আর ফাইনাল থিসিস নিয়েও একটু চিন্তায় আছি। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে ভালোই হলো, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে থিসিস প্রজেক্টে।" মিতা বললো।
"নিশ্চই সাহায্য করবো! তবে তুমিও কথা দাও, আমাকে সাহায্য করবে ঘরে ফিরতে!" বললো মৌ
"মানে ঠিক বুঝলাম না! তোমার আমার হেল্প লাগবে ঘরে ফিরতে।" বিস্ময়ের সাথে বললো মিতা।
"হ্যাঁ, আমি ঘরে ফিরতে চাই, আর পারছিনা এখানে থাকতে ! দম বন্ধ হয়ে আসছে মিতা।"
"কি বলছো তুমি? আমিতো মাথা-মুন্ড কিছুই বুঝতে পারছিনা।"
"তুমি আমাকে সত্যিই সাহায্য করবেতো? তাহলে আমি তোমাকে সব বলবো।"
"বললাম তো, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আমার বাবা এখানকার পুলিশ কমিশনার, যদি দরকার পরে আমি ওনাকেও বলবো হেল্প করতে।"মৌ কে আস্বস্থ্য করলো মিতা।

॥ ঘরে ফেরা ॥

প্রসেনজিৎ মন্ডল

মৌ বলতে শুরু করলো "ঠিক আছে, সব বলছি তাহলে! কিছু বছর আগে, আমি এই কলেজে এসেছিলাম অনেক আশা, কঠোর পরিশ্রম কে সঙ্গী করে একজন ভালো ডাক্তার হয়ে গরিব মানুষের সেবা করার সংকল্প নিয়ে। সব কিছু ঠিকই চলছিল, কিন্তু ৪র্থ ইয়ার থিসিস প্রজেক্ট করার সময় কলেজে আমার কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আসলে আমার থিসিস রিসার্চ টপিক ছিলো আফটার ইফেক্টস অফ রেস্পিরেটরি মেডিসিন। যেখানে আমি এমন কিছু সাধারণ কফ-কাশির ওষুধ খুঁজে পাই যেগুলো থেকে মানুষজনের জটিল কমপ্লিকেশন এর রিপোর্ট হচ্ছিলো, এর মধ্যে কিডনি বিকল হওয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার এর মতো ঘটনাও ছিলো। এগুলো আমি ঊর্ধতন কর্তাদের জানানোর অনেক চেষ্টাও করি কিন্তু কোনো লাভ হয়না। তাই নিজেই ঐসব ওষুধের পরীক্ষা করবো ঠিক করি। এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে আমার এক বন্ধু যে কিনা তখন যাদবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিকাল বায়োলজি তে কেমিক্যাল সায়েন্সে গবেষণা করছিলো। সে খুঁজে পায় যে আমাদের হাসপাতাল থেকে দেওয়া Coldrif ঔষুধে খুবই উচ্চমাত্রায় (~৪৭%) DEG বা Diethylene glycol নামের এক জৈব যৌগ পাওয়া গেছে যা সাধারণত industrial grade antifreeze liquid হিসেবে ব্যাবহৃত হয় ও শরীরের জন্য ভয়ানক বিষাক্ত। এটা জানার পর আমার নিজের প্রতি ভয়ানক রাগ ও ঘৃণা হচ্ছিলো, চোখের সামনে সেই সব ছোট ছোট শিশুদের মুখ গুলো ভেসে আসছিলো যাদের কে আমরা দিনের পর দিন ওই ওষুধগুলো দিয়েছি! হাসপাতালের স্টক রেজিস্টার বই ঘেঁটে দেখতে পাই যে এই ওষুধ গুলো তামিলনাড়ুর এক ফার্মা কোম্পানি থেকে আসছে এবং আমাদের নতুন অধ্যক্ষ আসার পর থেকে এই কোম্পানির থেকে ওষুধ নেওয়া অনেক বেড়ে গেছে।

আমার সমস্ত থিসিস রিসার্চ ও রিপোর্ট নিয়ে অধ্যক্ষকে দেখাতে উনি খুব বাজে ভাবে আমার রিপোর্ট গুলো মাটিতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন এইসব সস্তার রিপোর্ট আর প্রপোজাল অন্য কোথাও নিয়ে যাও, এইসবের জন্যে আমার সময় নেই। আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর আরো কিছু প্রফেসর কেও আমার রিপোর্ট দেখাই কিন্তু তারাও কেউ অধ্যক্ষের বিরাগভাজন হতে চাননা। আসলে উনি খুবই প্রভাবশালী ও তৎকালীন সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

তবুও ওই শিশুগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা শেষ আশা নিয়ে যাই সামনের টালা থানাতে। কিন্তু ওরাও আমার কোনো কথা শুনলনা, আমাকে বললো কোনো সমস্যা থাকলে অধ্যক্ষকে বলুন, উনি বললে আমরা দেখবো কি করতে পারি। নিরাশ হয়ে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন এক সাব -ইন্সপেক্টর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার, কিভাবে আমি সব জানলাম। উনি আমার রিসার্চ প্রপোসাল ও সব রিপোর্ট ওনাকে দিতে বললেন একটু স্টাডি করার জন্য এবং আমাকে আশস্ত করলেন যে উনি কিছু একটা করবেন।

ওই দিন রাতে আমারও নাইট ডিউটি ছিলো, সারা রাত ডিউটি করার পর ভোরের দিকে আমি এই রুমে এসেছিলাম একটু বিশ্রাম করতে! দু-চোখের পাতাটা একটু লেগেছে, এমন সময় মনে হলো আমাকে যেন কেউ টানছে, আচমকা কিছু লোক আমার হাত-পা আর মুখে কাপড় দিয়ে বেঁধে আমার ওপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। আমার সারা শরীর তীব্র যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন এরা আমাকে এইভাবে মারছে, আমি কি অন্যায় করেছি! আমি প্রচন্ডভাবে গোঙাছিলাম ও হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে বাঁচানোর একটা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিভাবে যে এদের হাত থেকে মুক্তি পাবো বুঝতে পারছিলাম না।

এমন সময় পেছনে থেকে একজন, "এই যা করার তাড়াতাড়ি সেরে বাইরে আয়" বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওই মৃদু আলোতেও তার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম। তিনি হলেন সেই পুলিশ অফিসারটি যাকে আমি আমার রিসার্চ প্রপোসাল ও রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম।

অন্য ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, এই মালটা কিন্তু খাসা আছে, খেয়ে দেখলে কেমন হয়! বলেই ওই লম্পট মাতাল ছেলে গুলো আমার শরীরের ওপর থেকে আমার আত্মসম্মান খুলে নিতে লাগলো। আমার দু চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে যাচ্ছিলো আর ভগবানের কাছে জানতে চাইছিলাম, হে ভগবান, আমার কি অন্যায় ছিলো যার এতো বড়ো শাস্তি আমি পাচ্ছি। আমি নির্বাক, অসহায় হয়ে পড়েছিলাম যখন ওই নরপিশাচ গুলো একেক করে আমার শরীরটাকে খুবলে খাচ্ছিলো। শুধু ভাবছিলাম, এরাও তো কোনো মায়ের গর্ভজাত, এদের বাড়িতেও তো নিশ্চয়ই মেয়ে-বোন রয়েছে, তাদের কাছে এরা মুখ দেখায় কেমন করে।

এরমধ্যে একজন আমার পা ধরে টানতে গেলে, আমার মাথাটা সজোরে একটা শক্ত কিছুতে আঘাত করে ও আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কতক্ষণ ওই ভাবে ছিলাম মনে নেই, তবে চোখ খুলে দেখি আমার শরীরটা ওই কোনাতে একটা চাদর ঢাকা দেয়া আর কত লোকজন, পুলিশ, আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর স্যারেরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুনলাম বাইরে নাকি একটা ছেঁড়া হেডফোন পাওয়া গেছে, ওটা নাকি অপরাধী ধরার সব থেকে বড়ো প্রমান, অথচ আমার রক্তমাখা সাদা চুড়িদার, আমার ডাইরি-ফোন কিছুই নেই, সব কে যেন সুন্দর করে সরিয়ে ফেলেছে! বলেই একটু থামলো মৌ।

|| ঘরে ফেরা ||

প্রসেনজিৎ মন্ডল

মিতার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে, ও বুঝতে পারছেনা কি করবে বা কি করা উচিত ওর। কিছুটা বিস্ময় ও সংশয় ভোরে মিতা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বেঁচে নেই!"

"আমি বেঁচে আছি সবার মনের মধ্যে! যতদিন মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও মনুষত্ব বেঁচে আছে ততদিন আমরা বেঁচে থাকবো। তাছাড়া আমাদের কে যে বাঁচতেই হবে রে, সমাজের ওই নিচুতলার গরিব মানুষ গুলোর জন্যে। আমরাই তো ওদের শেষ ভরসা, সমস্ত অন্যায়ের বিরুধ্যে, অবমাননার বিরুধ্যে। আর ওই নর পিশাচদের দল তো এখনো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের চরম শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার ও আত্মার শান্তি নেই। আসলে মাঝে মাঝে আমরা শিরদাঁড়াটা সোজা করে না দাঁড়ালে, পুরো সমাজব্যবস্থাটাই তো একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছো দিদি! তুমি বোলো আমাকে কি করতে হবে।"

"আয় এইদিকে", বলে ওয়াশরুমের এক কোনায় মিতাকে নিয়ে গেলো মৌ। "এই টাইলসটার নিচে আমার রক্তমাখা জামা, ডাইরিটা রয়েছে, সেইদিন তাড়াহুড়োতে এই জিনিস গুলো কে সরাতে পারেনি, পরে এই ওয়াশরুম সংস্কারের নামে আমার সমস্ত জিনিসগুলো এখানে লুকিয়ে দিয়েছে। এই ওয়াশরুম আমি এতোদিন পাহারা দিয়েছি, শুধু ওই শয়তান গুলোর হাত থেকে আমার এই শেষ ভরসাটুকুকে রক্ষা করতে। তোকে এই জিনিসগুলো দিয়ে অনেকটা হালকা লাগছে রে, মনে হয় এবার আমি ঘরে ফিরতে পারবো।"

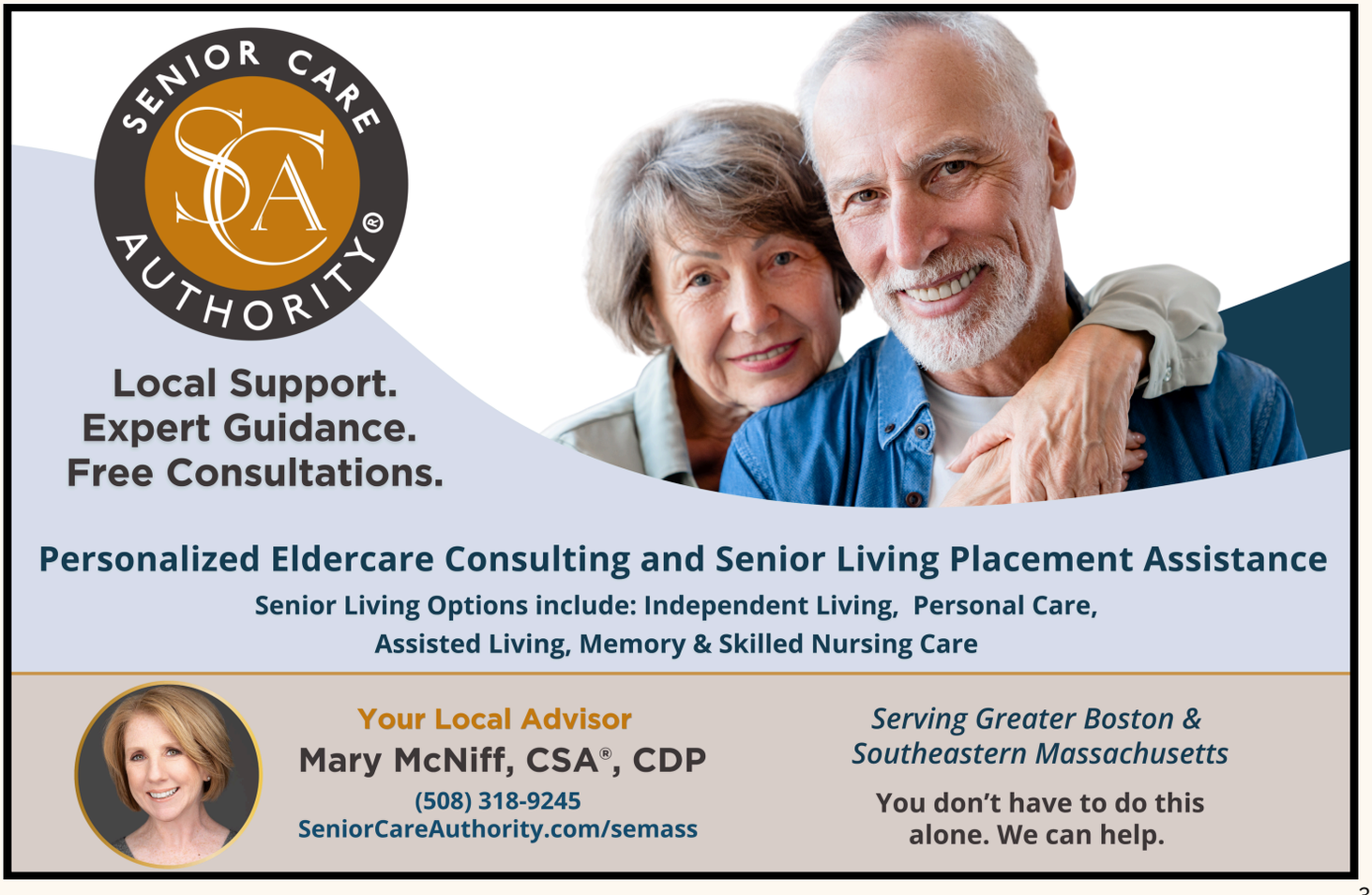
"আচ্ছা তুমি আমাকেই এইসব বলছো বা ভরসা করে তোমার শেষ ভরসাটুকু আমাকেই দিচ্ছো কেনো?এখানেতো আরো অনেক ডাক্তার বা নার্স রয়েছে।"

"তুই জানতে চাইলিনা তো যে ওই পুলিশ অফিসারটি কে ছিলেন?"

"কে ছিলেন? নাম মনে আছে তোমার?" বললো মিতা

"স্বার্থকরঞ্জন ব্যানার্জী!"

"কি, কি বললে দিদি? স্বার্থকরঞ্জন ব্যানার্জী? উনিতো আমার বাবা!"





ROCKLAND
TRUST
BANK
Where Each Relationship Matters®

।। বাড়ির পুজো ।।

সুপর্ণা দত্ত | প্রযুক্তিবিদ এবং লেখিকা

মা দুর্গা কে ডান দিকে রেখে প্রণাম করতে হয়, এটা কি আপনারা জানতেন? আমি তো আদ্যোপান্ত কলকাতার বাঙালি হয়েও জানতাম না| জানলাম আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ফস্টার সিটিতে চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপূজোয় এসে। অবাক কান্ড - তাই না?

“ দেবায়: পার্যাভে সদা তিষ্ঠান দক্ষিণে পারিপালায়াত। শুভম কুরয়াত সদা কার্যম জয়স্তস্য পদে পদে”। অর্থাৎ, দেবীকে দক্ষিণে রেখে স্মরণ করলে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন; আমরা প্রতি পদক্ষেপে জয়লাভ করব। বললেন মুখার্জিদা , চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর প্রধান পুরোহিত । মনটা ভরে গেল আনন্দে আর বিস্ময়ে।

পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মেনে পাঁচদিন ব্যাপী এই দেবীর আরাধনার সূচনা ২০২০ সালে। সারা পৃথিবী যখন কোভিড- ১৯ এর প্রকোপে স্তব্ধ; আশ্বিনের শরৎ আকাশে শোনা যায় না কোনো শঙ্খ ধ্বনি , কোনো ঢাকের আওয়াজ। আমরা প্রায় সকলেই নিয়তি ভেবে মেনে নিয়েছিলাম এই নিদারুণ পরিস্থিতিকে। মেনে নেননি ফস্টার সিটির এই দম্পতি - সুদীপ্ত ও পিয়ালী, যাঁদের ঘরে ওনাদের ক্লাবের ঠাকুর বিগত ১৫ বছর ধরে বাস করেন।

তাই দেবীর ইচ্ছায় শুরু হলো বাড়ির পুজো। সেই থেকে প্রতিবছর এই প্রথা চলে আসছে। বে-বাসীর দুর্গা এখন তাই চক্রবর্তী পরিবারের মা । ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান, অষ্টমীতে কুমারী পুজো, মধ্যরাত্রে ১০৮ পদ্ম ফুটিয়ে ৪৮ মিনিটের সন্ধি পুজো, নবমীর যজ্ঞ, দর্পণে বিসর্জন আর দেবী বরণ - ত্রুটি নেই কোনখানে। প্রতিদিন সযত্নে বাড়িতে তৈরি অন্ন ভোগ আর সন্ধ্যা ভোগের লুচি হালুয়া তো আছেই।

আর আছে বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আসা যাওয়া। অনেকদিন বিদেশে থাকার সুবাদে বহুবার শুনেছি, প্রবাসীরা অর্থ লোভে যন্ত্র হয়ে যায় । কিন্তু কোথায়? প্রতিদিন দিনে-রাতে কত মানুষের আনাগোনা দেখলাম। বিদেশে তো আর পুজোর ছুটি বলে কিছু থাকে না, ছেলেমেয়েদের স্কুলেরও বিরাম নেই । কিন্তু তাতে কি? কখনো অফিস যাওয়া-আসার পথে, কখনো লাঞ্চ ব্রেক এ , আবার কখনো দুই মিটিং এর মাঝে ক্ষণিক বিরতিতে বাঙালি ছুটে এসেছে মাকে অঞ্জলি দেবেন বলে অথবা শুধুমাত্র একবার প্রণাম জানাতে।

শুধু বাঙালি কেন? বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় এবং কিছু অ-ভারতীয়র মায়ের প্রতি আকর্ষণ সত্যিই মুগ্ধ করার মত। এক কাশ্মীরি মহিলার কথা এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়। কাশ্মীরে দুর্গাপুজো? ভাবছেন তো? আমিও হতবাক হয়েছিলাম। জানতে পারলাম পেশায় entrepreneur এই মহিলা শুধু বরণ করতেই আসেন নি , উনি নিজের বাড়িতে ১০৮ প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধিপূজাও করেছেন।

দুর্গাপুজো হবে আর গান বাজনা হবে না তাও আবার হয় নাকি? মহালয়ার সমবেত আগমনী গান আর ফিস ফ্রাই, আলুর চপ সহযোগে জয়তী চক্রবর্তীর মন ভরানো গানের বিজয়া সম্মেলনীও আছে এই দুর্গাপূজায়।

আজকে থিম পুজোর ভিড়ে এক কৃতী বঙ্গ সন্তানের এই শুভ প্রচেষ্টা সত্যিই সাধুবাদ পাওয়ার দাবি রাখে। আশা রাখি দেবী দুর্গার আশীর্বাদে এই মাতৃ আরাধনার আয়োজন আগামী দিনে আরো সুষ্ঠ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে ।

শুভ বিজয়া !



Taste Paradise:

Why Paradise Biryani Pointe is the Destination for Authentic Flavor

There is biryani, and then there is the royal, aromatic masterpiece served at **Paradise Biryani Pointe.** For food enthusiasts seeking a genuine culinary journey, this local hotspot delivers an unforgettable experience centered around rich traditions, deeply layered spices, and timeless recipes.



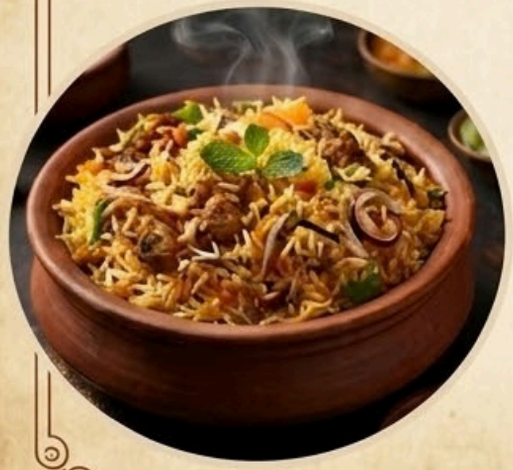
The Art of Authentic Dum Biryani

At the heart of Paradise Biryani Pointe's legendary menu is the age-old technique of *Dum* cooking. Premium, long-grain basmati rice and delicately marinated meats or fresh vegetables are sealed together in heavy vessels and cooked slowly over a low flame. This slow-infusion method allows every grain of rice to absorb the subtle nuances of saffron, cardamom, star anise, and fresh herbs, resulting in a dish that is light, immensely flavorful, and steeped in heritage.



A Menu Crafted for Every Palate

- **Tandoori & Appetizers:** Tender chicken tikka, succulent kebabs, and crispy vegetarian starters spiced to perfection.
- **Rich Curries:** Velvety Butter Chicken, robust Goat Curry, and comforting paneer dishes paired with freshly baked, hot garlic naan.
- **Vegetarian Delights:** A vibrant selection of vegetarian speciallies cooked with the same passion and traditional spice biends.



Atmosphere & Hospitality

Whether you are gathering for a family celebration, catching up with friends, or enjoying a quick weeknight indulgence, Paradise Biryani Pointe offers a warm, welcoming ambiance paired with attentive

Visit Us Today

Step inside to experience the vibrant aromas and bold flavors that set Paradise Biryani Pointe apart.

Dine-In | Takeout | Catering Available
Location: 127 turnpike Road, Westborough.MA
Reservations & Orders: 5088700007

Special Offer: Mention this magazine feature during your next visit to enjoy **10% off** your total dine-in bill!

DELTA COMMUNITY CENTER

Robotics for Kids

Organized by Delta Community Center

October 23
Introduction to Electricity

Learn about breadboards, wires, DC current, LEDs, resistors, and capacitors. Build simple circuits and understand how electronic components work together.

October 24
ESP32 and LED Programming

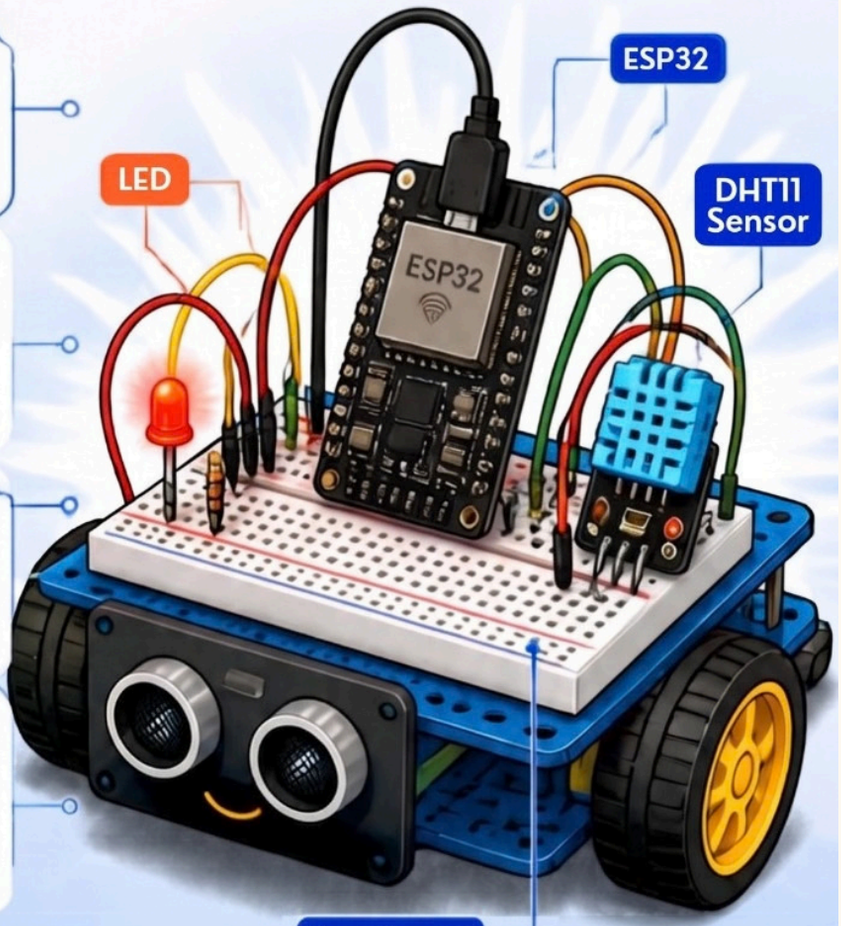
Use the Thony editor and UsB port to program an ESP32 microcontroller. Build abreadboard circuit and light an LED manually and with a Python program.

November 6-7
GPIO, Blinking, Bread, and SoS

Learn how to use ESP32 GPIO pins, create a blinking LED project, and explore the Bread (PWM) and SoS activities.

November 13-14
Introduction to Sensors

Use a DHT11 sensor to measure real-world temperature and humidity. Read read sensor data and display the values live using the ESP32.



Participants Will Learn To

- Build basic circuits on a breadboard
- Identify and use common electronic components
- Program an ESP32 using Python
- Control LEDs through GPIO (General-Purpose Input/Output) pins
- Read temperature and humidity data from a sensor
- Display live data from the physical environment.

REGISTER NOW

SCAN QR TO REGISTER

https://www.deltacommunitycenter.org/events?category=bcb5e9b5-4efd-4bf6-9e01-3d21cb3h712a

143 Lincoln Rd, North Easton, Holy Trinity Lutheran Church



50 WAYS

We *care* for you

SYNERGY® HomeCare

Care that moves you®

SYNERGYHomeCare.com

Proudly independently owned and operated.

EXPERIENCE LIFE-ENERGIZING CARE ON YOUR OWN TERMS, IN YOUR OWN HOME.

1. Medication reminders
2. Transportation and escort to doctor's appointments
3. Light housekeeping
4. Alzheimer's and dementia care
5. Fall prevention
6. Companionship
7. Assisting with bathing/showering
8. Laundry and ironing clothes
9. Checking food expiration dates and freshness
10. Prepare healthy meals
11. Grocery shopping
12. Changing linens
13. Picking up prescriptions
14. Transportation to social activities
15. Answering the telephone
16. Planning the day's schedule
17. Caring for house pets
18. Safety supervision
19. Brain fitness activities
20. Bringing in mail and newspapers
21. Playing games and cards
22. Taking out the trash
23. Answering the door
24. Washing dishes
25. Grooming and hygiene
26. Dusting and vacuuming
27. Transportation to hairdresser
28. Meal planning and preparation
29. Assistance in and out of bed
30. Helping with wardrobe selection and dressing
31. Assistance with light exercise
32. Incontinence care
33. Family respite care
34. Letter writing
35. Assistance to family visits
36. Birthday and anniversary reminders
37. Shopping for gifts
38. Maintaining calendar
39. Scheduling appointments
40. Sorting and reading mail
41. Hospice and palliative care
42. Reading books, newspapers, magazines aloud
43. Assisting with art and crafts, puzzles, sewing
44. Personal care
45. Mailing bills and letters
46. Discussing current events
47. Escort to important events
48. Reminisce about the past
49. Renting and playing movies
50. Assistance watering houseplants

We'll help you get the most out of every day.

Call 774-836-5643

© 2021 SYNERGY HomeCare. All rights reserved.